অন্য রবীন্দ্রনাথ ঃ একটি গলপ-নিবন্ধ

সাদ কামালী

এই প্রবন্ধটি এন.এফ.বি পত্রিকার এক প্রবল ইসলামপন্থি এবং হিন্দু-বিদ্বেষী (হিন্দু-বিদ্বেষের সাথে সাথে যে রবীন্দ্র-বিদ্বেষ পাশাপাশি চলে আসে তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না) লেখকের অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত একটি লেখার প্রতিক্রিয়া হিসেবে লেখা হয়েছিল, যে লেখায় বলা হয়েছিল যে, *পুরো রচনাবলিটিকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দিলেও বাংলা সাহিত্যের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না!* সত্যিকারের আব্দুলই বটে! আমি আমার আগের একটি লেখায় খুব পরিস্কার করেই বলেছি ভাষা, শিল্প সাহিত্য শুধু নয়, বাঙালীর শিল্প-আত্মা তৈরীতে রবীন্দ্রনাথের ভুমিকা অনেকটা জনকের মত। তার পরেও কিন্তু মুক্ত-মনা হিসেবে দাবী করেছি 'তবুও কি জনকের প্রতি মোহমুক্ত খোলা চোখে তাকাতে পারব না'? অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা তাঁর চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে নির্মোহ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করে নতুন নতুন দিক উন্মোচন করা এক জিনিস, আর আবদুলদের সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানো মিথ্যাচার সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শঙ্কার ব্যাপার এই সমস্ত অজ্ঞ 'আবদুল'দের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাংলাদেশে বেড়ে চলছে।

এ লেখাটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমার অন্যান্য পূর্ববর্তী রচনাগুলো থেকে ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে হতে পারে। মুক্ত-মনায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পুনঃপ্রকাশের জন্য পাঠানো হল।
১০/১৬/০৫

বসুন্ধরা গ্রামের রাধারানী দাস বিধবা হওয়ার পাঁচ বছর পর গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল । গ্রামের মানুষ হতদরিদ্র রাধারানীকে এই অনাচারের পরও মাফ করে দেয় তখন । হয়ত ওই গ্রামের কর্তা পুরুষগুলি কবি রবীন্দ্রনাথ-এর মতো জানত, "সমাজে যদি অশান্তি না ঘটে, তাহলে ব্যাভিচার ব্যাভিচারই হয় না ।"[১] যাইহোক, রাধারানী এক ছেলের জন্ম দিল, ছেলের নাম রাখল **আব্দুল** । গ্রামের মানুষের চোখের ভ্রু আরো একবার বাঁকা হয়, আব্দুল কেন, মুসলমান নাম ? রাধা ঠোঁট উল্টায়, আব্দুল হইল চাকর, বান্দির পেটে আব্দুল হবে না কি ঠাকুর হবে ? যুক্তির কথা । আব্দুলের বাপ মুসলমানও হতে পারে । রাধারানী অতঃপর অন্য অন্য মায়েদের মতো ছেলেকে দুধকলা খাইয়ে শরীর পুষ্ট করে তোলে, ছড়া গান কথা বলে সুন্দর করে কথা বলতে শেখায়, দুইপায়ের ওপর দাঁড়াবার জন্য যা যা দরকার অভাবি রাধারানী সাধ্যমতো তাই আব্দুলের জন্য করে । আব্দুল দাঁড়াতে শেখে । স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে শিখেই তার মনে হয় রাধা নাম্নী জীর্ণ বুড়ি মার আর কোনো দরকার নেই । বুড়িটাকে সাগরে ফেলে দিলেও কোনো ক্ষতি হবে না । আব্দুল সিদ্ধান্ত নেয়, রাধারানীকে সাগরে ফেলে দেবে । গ্রামের মানুষ এই খবর জেনে দুঃখ পায় । তাদের কেউ কেউ তখন

আবার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে । রবীন্দ্রনাথ সেই কবে ১৯২৫ সনেই স্পষ্ট করে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন । গত শতাব্দীর শুরু থেকে বিলাতের মেরি স্টোপস, সুইডেনের এলেন কে, আমেরিকার মার্গারেট স্যাংগার প্রমুখ জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেছিলেন । মিসেস স্যাংগার এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর মত জানতে চান । গান্ধীজি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে, সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ছিলেন তিনি । রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে এক চিঠি নিবন্ধে মিসেস স্যাংগারকে লেখেন,

> "I am of opinion that Birth Control Movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause of peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its original limits. In a hunger- stricken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children in existence than could properly be taken care of, causing endless suffering to them and imposing a degrading condition upon the whole family. " [২]

ভারত-বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের এই বাণী কত প্রকটভাবে আজ সত্য হয়ে উঠেছে । রাধারানীর জীবনেও তা ভয়াবহ ভাবে সত্য, অনাকাঙ্খিত সন্তানটি তার জীবন বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । অথচ গত শতাব্দীর কুড়ি দশকেই রবীন্দ্রনাথ ওই রাধারানীদের বিপদের কথা বুঝতে পেরে অনাকাঙ্খিত জন্ম এড়ানোর জন্য জন্মনিরোধক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর স্নেহধন্য দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে লেখেন, "ব্যাভিচারের ফলে যদি সন্তানসমস্যা দেখা দেয়, তাহলে আজকাল সেটাও সমস্যা নয় । কেননা কন্ট্রাসেপ্টিভ বেরিয়ে গেছে । নিবারণের উপায়গুলোও সহজ । সুতরাং গর্ভধারণ করতে হয় বলে দেহকে সাবধান রাখার দায় আর তেমন নেই ।"[১] রাধারানী এতোসব জানে না, জানলে আব্দুলের মতো সন্তানের জন্ম হতো না । তবে আব্দুল জানে, রবীন্দ্রনাথের কথা সে শুনেছে, কিছু হয়তো পড়েছেও । সেজন্যেই তার এত রাগ, 'ব্লাড সাকার', 'কম্যুনাল', 'হিন্দু' বলে গাল দিতে তার বাধে না ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা নিয়ে বিস্তর লেখা, অহেতুক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে । ওইসব তর্কবিতর্কে সম্পুর্ণ রবীন্দ্রনাথের তুলনায় কেউ হয়তো বালক রবীন্দ্রনাথের পরিবার প্রভাবিত কৈশোরিক চিন্তাকেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । কেউ চেয়েছে বিতর্করহিত এক মহামানবে পরিণত করতে । কিন্তু সঠিকভাবে পরিণত বয়সের স্থির প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরিষ্কার করেছেন তাঁর ধর্মমত -

> "আমি হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । আমি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। আমার ধর্ম বিশ্বজনিনতা এবং সেটাই হিন্দুধর্ম ।" [৩]

১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন, তার আগে ১৯২৪ সালে চীনে ‘কবির ধর্ম’ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। দুটি বক্তৃতা Talks in China এবং Meaning of Art নামে Visva-Bharati Quarterly প্রকাশ করেন ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সালে। পরে ১৯৩৬ সালে Contemporary Indian Philosophy গ্রন্থে The Religion of An Artist প্রবন্ধে ওই বক্তৃতাদুটি স্থান পায়। যাইহোক, ওই দুটি লিখিত বক্তৃতায় কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্ম প্রসঙ্গে আরো বলেন,

> " … My religion is essentially a poet’s religion. Its touch comes to me through the same unseen and trackless channels as does the inspiration of my music. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other … " ।

আব্দুলের জন্য আরো কিছু উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথ থেকেই উল্লেখ করব, তবে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বিষয়ে দরকারি কথা বলতে গেলে তা রচনাবলির কয়েকটি খণ্ডের সমান হয়ে উঠবে। শুধু আব্দুলকে বলার জন্য যতটুকু বলার বলব। অযোধ্যার বাবরি মসজিদ নিয়ে উগ্র হিন্দুদের অনেক উগ্রতা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। বাবরি মসজিদের স্থানেই রামের জন্ম সেই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দাবি আরো তাদের উগ্র করে তুলেছিল। আর রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে বাঙালি আদর করে বলেন বিশ্বকবি, তাঁর সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এই খেতাব পেলেও আব্দুল খুব নাখোশ, কাজী নজরুল ইসলামকেও কেন বিশ্বকবির খেতাব দেওয়া হলো না। কাজী কম কোথায়! আমপাড়ার সফল অনুবাদক, অজস্র হামদ্, নাথ, কীর্তন ভজন রচয়িতা কাজী নজরুল ওই রবীন্দ্রনাথের জন্যই বিশ্বকবি খেতাব পেলেন না বলে আব্দুলের খুব বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ কত বড় কবি তার সাক্ষ্য তাঁর কবিতা, মানুষ হিসেবে কত মহান ও উদার সেও তাঁর রচনাবলিই সাক্ষী দেয়। হিন্দুদের দাবি দীর্ঘকালীন দাবি হলেও কবি রবীন্দ্রনাথ ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় রামের জন্মভূমি নিশ্চিত করে দেন - নারদ কহিলা হাসি,

> "সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি, রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীনিন্দার জন্য মনুসংহিতার তীব্র সমালোচনা করে বলেন,

> "মনুসংহিতায় স্ত্রীনিন্দাবাচক যে-সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়।"

এই প্রবন্ধে তিনি মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীষ্মের নারী নিন্দার সমালোচনা করে বলেন,

"স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা স্ত্রীলোককে যথার্থ সম্মান করতে অক্ষম ।"

কবি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বোঝার জন্য অন্তত **কালান্তর** গ্রন্থখানি এবং হেমন্তবালা-কে লিখিত চিঠিগুলি যদি আব্দুল পড়ে তবে সবচেয়ে তারই বেশি উপকার হবে । তাহলে হয়তো যে-মায়ের জন্য জন্ম ও জীবন পেয়েছে সেই মাকেই সাগরে ফেলে দেয়ার পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে ।

মুসলমানদের সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়েও অনেক কথা, বিশেষত জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন মুসলমান প্রধান এলাকায় জমিদারি করেছেন । জমিদারি রবীন্দ্রনাথের অর্জন নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে অর্পিত । প্রমথ চৌধুরীর **রায়তের কথা** বইয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির 'জমি' আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। ... আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।"

এই জমিদারির কাজে প্রথম শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, হরিজন ব্রাহ্মণ আর মুসলমানের মর্যাদাভিত্তিক আসন তুলে সবাইকে একই মর্যাদায় বসিয়ে দেয়া । সদর নায়েবমশাই প্রথমে রাজি নয়, কিছুতেই জাতপ্রথা ভাঙতে পারবে না । রবীন্দ্রনাথ অনড়, আসনের জাতিভেদ তুলে না দিলে তিনি কিছুতেই বসবেন না । কবি রবীন্দ্রনাথ বললেন,

"প্রাচীন প্রথা আমি বুঝি না, সবার জন্য একাসন করতে হবে । জমিদার হিসেবে এই আমার প্রথম হুকুম ।"

শুধু তাই নয়, জমিদার হিসেবেও অভিষেক সেদিন, প্রথম ভাষণে তিনি বললেন, "সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে । এটাই আমার সর্বপ্রথম কাজ ।"[৪] আশা করি সাহা এবং শেখ বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে তা আর আব্দুলকে বলতে হবে না । **কালান্তর** গ্রন্থে আব্দুল আরো জানতে পারবে মুসলমানদের সম্পর্কে, এমনকি হিন্দুদের সমপর্কেও, রবীন্দ্রনাথের মতামত ।

ঘরে বাইরে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিখিলেশ, যাকে আলোচকগণ 'নিখিলেশ আসলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই' বলে মনে করেন । সেই নিখিলেশের একটি কথার উল্লেখ না করে পারছি না,

"দেশে মহিষও দুধ দেয়, মহিষেও চাষ করে । কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়ায়, তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসে । কেবল

ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয়, তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।"

বেচারা আব্দুল, আপনাকে আরো পড়তে হবে, অন্তত তিনটি মুসলমানি অকেশনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা বা বিবৃতি । রবীন্দ্রতথ্যবিশারদ গবেষক অমিতাভ চৌধুরী **ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ** গ্রন্থে এই বক্তৃতা বিবৃতির খবর দিয়েছেন । ১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর বোম্বে শহরে 'পয়গম্বর দিবস' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মির্জা আলি আকবর খাঁ । এই সভায় রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী লিখে পাঠান, বাণীটি পাঠ করে শোনান কংগ্রেসের বিখ্যাত নেতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু । কবি রবীন্দ্রনাথ সেই বাণীতে লিখেছিলেন,

"জগতে যে সামান্য কয়েকটি ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম । মহান এই ধর্মমতের অনুগামীদের দায়িত্বও তাই বিপুল । ইসলামপন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্মবিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপর ছাপ রেখে যায় ।"

১৯৩৪ সালের জুন ২৫ তারিখে মিলাদুন্নবি দিবস উপলক্ষ্যে বেতার প্রচারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি বাণী লেখেন,

"ইসলাম পৃথিবীর মহাত্তম ধর্মের মধ্যে একটি । এই কারণে তার অনুবর্তিগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্য দিতে হবে । ... আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও সান্তনা কামনা করি ।"

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি ২৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে নয়াদিল্লীর জামে মসজিদ প্রকাশিত **পয়গম্বর** সংখ্যার জন্য একটি শুভেচ্ছাবার্তা লিখে পাঠান । সেই বার্তায় তিনি বলেন,

"যিনি বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, সেই পবিত্র পয়গম্বর হজরত মহম্মদের উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি । মানুষের ইতিহাসে এক নতুন সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছিলেন পয়গম্বর হজরত, এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ ধর্মাচরণের আদর্শ । সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি পবিত্র পয়গম্বরের প্রদর্শিত পথ যাঁরা অনুসরণ করছেন, আধুনিক ভারতবর্ষের সুসভ্য ইতিহাস রচনা করে তাঁরা যেন জীবন সম্পর্কে তাঁদের গভীর আস্থা এবং পয়গম্বরের প্রদত্ত শিক্ষাকে যথাযথ মর্যাদা দেন ।"

নিজ গোত্রের বাইরের মানুষ ও পৃথিবীর জন্য, সুদূরের জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতা শুনুন; তাঁর The Religion of Man গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ঃ

> My banished soul sitting in the civilized isolation of the town-life cried within me for the enlargement of the horizon of its comprehension. I was like the torn-away line of a verse, always in a state of suspense, while the other line, with which it rhymed and which could give it fullness, was smudged by the mist away in some undecipherable distance.

আবার, ছিন্নপত্রাবলীর ২৩৮ পত্র পড়ে দেখুন, "ঠিক যাকে সাধারণত ধর্ম বলে সেটা আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারিনে, কিন্তু মনের ভিতরে ক্রমশ যে-একটা সজীব পদার্থ সৃষ্টি হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি । বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয় - একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নতুন অন্তরিন্দ্রিয় । ... শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারিনে, কিন্তু যে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই চলে ।"

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বিপ্লবমুখী ছিল না, স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ আর দশজনের মতো ঝাঁপিয়ে না পড়ে বিষয়টি তিনি বিবেচনা করেছেন উৎপাদন, অর্থনীতি আর জনমানুষের ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে । **ঘরে বাইরে** উপন্যাসে তার চিন্তার স্বরূপ দেখা যায় নিখিলেশের ভিতর । কাপড়ের কল নির্মাণ, দেশলাই তৈরির প্রচেষ্টা, ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জাহাজ চালনা ইত্যাদির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার স্বদেশবোধের পরিচয় দেন । জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইটহুড উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বৃটিশরাজকে । পরের বছর অর্থাৎ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রথম বার্ষিকী ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠান,

> "আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে পাঞ্জাবে একটি মহাপাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ চারবছর ধরে যে দানবীয় সংগ্রাম বিধাতার সৃষ্ট এই জগৎকে আগুনে দগ্ধ ও বিষে কলঙ্কিত করেছে, তারই আসুরিক ঔরস্য হল এই জালিয়ানওয়ালাবাগ ।"

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের **রবীন্দ্রজীবনী** তৃতীয় খণ্ডে বাংলায় অনুদিত এই চিঠি পাবেন । মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই হত্যাকাণ্ডের পরপর কংগ্রেসের যে বৈঠক বসে, তাতে সভাপতিত্ব করেন মতিলাল নেহরু । বৈঠকে জওহরলাল নেহরু এবং জিন্নাহও উপস্থিত ছিলেন । **দ্য ট্রিবিউন** কাগজের সাংবাদিক অমল হোম সেদিন জওহরলাল নেহরুকে অনুরোধ করেন রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ নিয়ে যেন একটি প্রস্তাব নেওয়া হয় । অনেক অনুরোধের পর জওহরলাল সভাপতি মতিলালকে এই বিষয়ে একটি চিরকুট দেন, সভাপতি তা চশমার

খাপের নিচে রেখে দেন । দ্বিতীয়বারও একই ঘটনা ঘটে । 'হিন্দু কম্যুনাল' রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড উপাধি ত্যাগের ওপর কোনো আলোচনা সেদিন কংগ্রেস করেনি ।

সম্প্রতি প্যালেস্টাইন এবং ইসরাইল আবার সংবাদ শিরোনাম হয়ে উঠেছে । যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ইসরাইল যুক্তি ও মানবতাবোধহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেই ১৯৩০ সালে প্রকাশিত **জুয়িশ স্ট্যাণ্ডার্ড** পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে ইহুদিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

> "গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ইহুদি ও আরবরা এক পরিবার, হ্যাঁ এক মহান পরিবারের সদস্য । ... আরবরা তো আপনাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ । ... আরবদের তুলনায় তারা *[পশ্চিমা দেশ]* সত্যি সত্যি আপনাদের চেয়ে দূরবর্তী । আরবদের সঙ্গে আপনাদের অনেক মিল আছে, ওদের সঙ্গে *[পশ্চিমাদেশী]* তো কোনো বিষয়েই আপনাদের মিল নেই । এমনকি যন্ত্রসংস্কৃতির দেশ যে আমেরিকা, সেখানেও আপনারা একই সঙ্গে ইহুদি আমেরিকান হিসেবে বসবাস করতে পারেন । কিন্তু আপনারা একই সঙ্গে ইহুদি ও প্যালেস্টাইন হতে পারেন না কেন ?"

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনাবলীর ৩য় খণ্ড থেকে করুণাময় গোস্বামী এই সাক্ষাৎকার অনুবাদ করে এপ্রিল ২৬, ২০০২ তারিখের দৈনিক **জনকণ্ঠে** প্রকাশ করেন। আব্দুলের মা রাধারানী হলেও আব্দুল মোহাম্মদের অনুসারী । কিন্তু আব্দুল কথিত 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথ মোহাম্মদের মতো ফুল ভালবাসতেন, ফুল উদ্ভিদ কৃষি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। এই ভালবাসা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছেলে রথীন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণ মিশন বা মাদ্রাসায় না পাঠিয়ে কৃষি শিখতে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন । আব্দুল যদি সুন্নত হিসেবে ফুল ভালবেসে থাকে, তবে সেই ফুলের অনেকগুলির নাম রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন, যেমন 'বাগান বিলাস', 'বাসন্তী', ইস্পানি', 'মধুমঞ্জরী', 'জাতি', 'তারাঝরা', 'নীলমণিলতা', 'বনপুলক', 'সোনাঝুরি', 'হিমঝুরি', 'ফুলঝুরি', 'অগ্নিশিখা' ইত্যাদি । [৫]

বিশ্ববোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক কবি রবীন্দ্রনাথ-এর মুর্তি বিশ্বের বহু দেশের মতো চিনেও এই ২০০০ সালের ৩১ মে তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয় । আর চিনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ্য রয়েছে বহুবছর থেকেই । নবীজি শিক্ষার জন্য সুদুর চিনে যেতে বলেছিলেন । চিন নিজেই এসে গ্রহণ করেছে প্রাচ্যের এই প্রধান মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে । মাদ্রাসা শিক্ষার অচলায়তনের ঘেরে বন্দি আব্দুল গং এখন রবীন্দ্রনাথকেই সমূলে বিনাশ করতে পারলে খুশি । কিন্তু শকুনের দোওয়ায় তো গরু মরে না, ডোবা নালার পক্ষেও সম্ভব নয় অনন্ত প্রান্তরকে প্লাবিত করার । আব্দুলের গোস্‌সা, অক্ষম রাগ হয়তো এজন্যেই । স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে-কয়েকটি অর্জন সম্ভব হয়েছে, তার একটি হলো বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির রচনাকে গ্রহণ করা, তবে তা রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে নয়, তিনি তো কত আগেই পর্দা নিয়েছেন । বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতারাই 'আমার সোনার বাংলা'-কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছেন । তো, খামাকা কেন কবিগুরুর ওপর রাগ করেন ।

শিলপবোধহীন আব্দুল চলচ্চিত্র বিষয়েও নিজের অজ্ঞতা জাহির করতে লজ্জা পায় না। আব্দুলের ধারণা ষাট দশকে তার পুর্ব পাকিস্তানে কিছু অসাধারণ ছবি নির্মিত হয়েছে। হিন্দু সত্যজিতের তুলনায় তা কোনো অংশেই কম না। উদাহরণ হিসেবে সে **কাচের দেয়াল**-কে দাখিল করেছে। **কাচের দেয়াল** মেলোড্রামার সাথে **চারুলতা** বা **অপরাজিত**-র তুলনা মুর্খ আব্দুলই করতে পারে। শুধু বলব শান্তিনিকেতনের ছাত্র সত্যজিৎ রায়ও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বমানব। এবং রবীন্দ্রনাথ সেই ১৯২০ দশকেই চলচ্চিত্র শিলপকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, সত্যজিৎ রায়ও সেই মৌলিক ধারণা পোষণ করতেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির ছোটভাই মুরারি ভাদুড়িকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালের ২৯ নভেম্বর তারিখে চলচ্চিত্র শিলেপর স্বরূপ সম্পর্কে লেখেন,

> " ... আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নতুন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা যায়নি। ... আপন সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক কলাবিদ্যার লক্ষ্য। নইলে তার আত্মমর্যাদার অভাবে আত্মপ্রকাশ ম্লান হয়। ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে - তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। করা কঠিন, কারণ কাব্যে বা চিত্রে বা সঙ্গীতে উপকরণ দুর্মুল্য নয়, ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মুলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টিশক্তির নয়। ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিৎ যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পুর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষার মাথার উপরে আর একটা ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে যদি দেয় তবে সেটাতে তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারায় সঙ্গীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পরে, তেমনি রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মেষিত হবে না। হয় না যে সে কেবল সৃষ্টিকর্তার অভাবে, এবং অলসচিত্ত জনসাধারণের মুঢ়তায়, তারা আনন্দ পাবার অধিকারী নয় বলেই চমক পাবার নেশায় ডোবে।"[৬]

আহমদ শরীফ-এর **ইদানিং আমরা** গ্রন্থের একটি নিবন্ধের কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখছেন,

> " ... আমরা বাঙালীরা দিনে যতবার রবীন্দ্রনাথের নাম নানাভাবে শুনতে পাই কিংবা বিভিন্ন প্রয়োজনে উচ্চারণ করি ততবার উপাস্যের নামও হয় না শ্রুত বা উচ্চারিত। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ তথা আজকের পাক-ভারত-বাংলাদেশে বৈশ্বিক চেতনাসম্পন্ন এত বড় মনীষী-মনস্বী কবি কখনো আবির্ভুত হননি। চেতনালোকের বিরাটত্বে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে, অনুভবের

গভীরতায়, বোধের ব্যাপকতায় ... আঙ্গিক বিচিত্রতায় রবীন্দ্র-সাহিত্য একটি রূপের ও রসের পাথার - একটা চেতনা জগৎ ।"

আহমদ ছফা **রবীন্দ্রনাথ** প্রবন্ধে সহজ ও গভীর সত্য কথাটি লিখেছেন,

"আমাদের আনন্দ, আমাদের গৌরব রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষাকে মানুষের উপযোগী ভাষা হিসেবে রূপায়িত করেছেন । রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা মানুষ হওয়ার প্রেরণা পাই ।"

রবীন্দ্রপ্রবন্ধ ঃ রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা গবেষণা গ্রন্থে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিবিদ নন, ক্রুর বাস্তববাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদও নন । তিনি উদার মানবতাবাদী রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তাবিদ । তাঁর দৃষ্টি সমস্যার মূল অবধি পোঁছায়, সমস্যার সাময়িক সমাধানের চেয়ে চিরসমাধানের জন্য তিনি ব্যগ্র ।"

এরপরও আব্দুল যদি মা রাধারানী অথবা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি সাগরে ফেলে দিতে চায়, দিক । সাগরের বুক ফুঁড়ে একদিন বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের মতো আরো একটি রবীন্দ্রভূমি জেগে উঠে বাঁধভাঙা সুখে মিলনের গান গাইবে, অনন্তকাল ।

---

[১] 'নারীর ব্যভিচার' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর স্নেহধন্য দিলীপকুমার রায়কে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন, সেই চিঠির থেকে উদ্ধৃত । **ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ** ; অমিতাভ চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; ১৪০০, *জন্মনিয়ন্ত্রণ ও রবীন্দ্রনাথ,* পৃঃ ৩৩ । <প> [২] **একত্রে রবীন্দ্রনাথ,** অমিতাভ চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং ; ১৩৯০; *রবীন্দ্রনাথ ও নাসবন্দী,* পৃ ঃ ৪৬৪ ।

[৩] **ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ** ; অমিতাভ চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; ১৪০০, *জন্মনিয়ন্ত্রণ ও রবীন্দ্রনাথ,* পৃঃ ১ । গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে আদমসুমারির সময় রবীন্দ্রনাথ হিন্দু না ব্রাহ্ম এই তর্ক শুরু হয় । তখন তিনি এক বিবৃতিতে তাঁর ধর্মমত এইভাবে প্রকাশ করেন ।

[৪] **একত্রে রবীন্দ্রনাথ,** অমিতাভ চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং ; ১৩৯০; *জমিদার রবীন্দ্রনাথ,* পৃ ঃ ১৭৬ ।

[৫] **অনুষ্টুপ** ; চতুর্থ সংখ্যা, ১৪০৭; অনুষ্টুপ প্রকাশনী, *কবিকৃত নামে কয়েকটি দেশি ও বিদেশি ফুল,* দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।

[৬] মুরারি ভাদুড়ি চলচ্চিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে তাঁর মত দেন । মূল চিঠিটি রক্ষিত আছে কলকাতায় 'টেগোর রিসার্চ ইন্স্টিট্যুট'-

এ । **রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্রবোধ**, রজত রায়; সাহিত্যশ্রী, ১৩৮৪ ; কলকাত া; *রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্রবোধ,* পৃঃ ৩-৪ ।